জর্জ

বাসব দাশগুপ্ত

৩

হারানো দিনের ভাষা স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে পিছনে চাওয়া

শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে বেলঘরিয়ায় নেমে আরও সাড়ে তিন মাইল দূরে নিমতা। কোনোকালে এখান দিয়ে সোনাই নদীর ধারা বয়ে যেত। এখন নদীটাই হারিয়ে গেছে, রেখে গেছে কতকগুলো ঝিল। কল্পনায় ঝিলগুলোকে জলধারা দিয়ে যুক্ত করে নিলে এখনও একটা নদীর আভাস পাওয়া যায়।

বহু প্রাচীন এই জনপদে জন্মেছিলেন মঙ্গলকাব্যের কবি কৃষ্ণরাম দাস। অনেক পরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। যদিও এখন সেই গৌরব শুধু বৃদ্ধদের কথায় সীমাবদ্ধ। এদিকে ওদিকে রিফিউজি কলোনি আর মাঝে মাঝে নতুনভাবে গড়ে ওঠা বসতি। বিয়ের পর প্রায় চার বছর দেবব্রতর রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়িতে দোতলায় থাকার পর নিমতায় ছোট্ট বাড়ি করে চলে এসেছে ললিতা আর তার স্বামী। ললিতার স্বামী নিরঞ্জন বেলঘরিয়ার একটা

স্কুলে মাস্টারি করে। লম্বা, রোগা চেহারা। ফর্সা রঙ, ধবধবে সাদা চুল। খুব কম কথা বলা মানুষ।

ইস্কুল ছুটির পর এদিকে ওদিকে ছাত্র পড়িয়ে নিরঞ্জনের বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। বড় রাস্তার পর গলিপথে মিনিট দেড়েক হাঁটার পর ওদের বাড়ি। ঐটুকু পথ হাঁটতেই মনে হয় শরীর ভেঙে আসছে। শিক্ষকদের যা বেতন তাতে ভদ্রভাবে বাঁচা যায় না, নিরঞ্জনের আবার বাবা, মা জীবিত। ললিতাও একটা স্কুলে পড়ায়। মাসের পর মাস সরকারের টাকা আসে না, প্রতিদিন ছাত্ররা যা বেতন দেয়, হেডমাস্টার সেটা ভাগাভাগি করে কয়েকজনকে দিয়ে দেন। সেই টাকার জন্য তীর্থের কাকের মতো শিক্ষকদের বসে থাকা। মাঝে মাঝেই ওর মনে হয় আদর্শের জন্য শিক্ষকতায় না এসে ব্যাঙ্কের চাকরিতে থেকে গেলেই হত। এই অঞ্চলে নতুন কলোনি গড়ে উঠেছে, অনেক ছেলেই বংশে প্রথম স্কুলে আসছে। ওদের মুখ দেখে ভালো লাগে।

বড় ছেলের জন্মের পরেই হার্টের অসুখ ধরা পড়ল। ছোট্ট শিশুটা মাঝে মাঝেই নীল হয়ে যেত, শ্বাসের কষ্ট। ললিতারা নিমতায় চলে আসার সময় দেবব্রত ওকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। ওখানে ওষুধ-পত্তর, ডাক্তারের সুবিধা। মেজছেলে আর দুই মেয়েকে নিয়ে ললিতা এখন ঘোর সংসারী। বিয়ের আগের সেই ছটফটে মেয়েটিকে দেখলে চেনা মুশকিল। বৃদ্ধ বাবা, মা অসুস্থ, ছেলেমেয়ে, পড়ানো, রান্না, কাজের শেষ নেই।

রাতে খাওয়ার পর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে নিরঞ্জন। ললিতা বাসনপত্তর গুছিয়ে রেখে, পান সেজে হাতে দিয়ে পাশে দাঁড়ালো। ছোট্ট বাগান, দু-একটা আম আর নারকেলগাছ। ঝিরঝির পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদটাকে সামান্য দেখা যাচ্ছে।

'খোকনের জন্য মনটা কেমন করছে। গত রবিবার ওকে দেখতে যাওয়া হল না। ভালো লাগছে না।'

নিরঞ্জন উত্তর দিল না। গত রবিবার ওর বাবা হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। ডাক্তার-বদ্যি করে যখন বোঝা গেল তেমন ভয়ের কিছু নেই, তখন আর রাসবিহারী যাওয়ার সময় নেই। এমনিতে প্রায় প্রতি রবিবার ওরা রাসবিহারীতে খোকনকে দেখতে যায়।

'ভাবছি কাল ইস্কুলে যাব না। বাচ্চাদের নিয়ে খোকার ওখানে যাব। কাল শনিবার, তুমি রবিবার বিকেলে আমাদের নিয়ে এসো।'

নিরঞ্জন চুপ। শোয়ার আগে খালি গা, লুঙ্গি পরা, ফর্সা গায়ে চাঁদের আলো, খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কি যেন ভাবছে।

'কি হল উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

'কি বলব? আমারও খোকনকে দেখতে মন চাইছে। উপায় নেই। কাল স্কুলে স্যালারির পার্ট পেমেন্ট আছে। তারপর শনিবার ছুটির পর দুটো টিউশ্যন।'

'সত্যি কবে যে ছেলেমেয়েগুলো একটু বড় হবে। এই দৌড়াদৌড়ি আর পারি না। খোকার বাড়িওয়ালা ওকে উঠে যাওয়ার জন্য কেস-টেস করছে। কতবার বললাম, এসব

ছেড়েছুড়ে আমার কাছে চল। আমার বাড়িতে না থাকবি তো, আলাদা কাছাকাছি বাড়ি করে নে। কিন্তু শুনবে না আমার পরামর্শ।'

'আমি ভাবছি খোকনের কথা। শরীর ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। আগের মতো আর হইহুল্লোড় করতেও পারে না আজকাল। ক্লান্ত দেখায়।' নিরঞ্জন বলল।

দুজনেই চুপ। খুব ধীরে হাওয়া দিচ্ছে। বাগানের গাছের পাতায় শিরশির শব্দ। জন্মের দেড় মাসের মধ্যেই ধরা গেল খোকনের হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে ছিদ্র আছে। যার জন্য শ্বাসের কষ্ট। ছোট হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরত কাউকে, শ্বাসকষ্টের সময়। কি করুণ চোখে তাকাতো। দেবব্রত এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে কতবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এত রাতে খোকন কি করছে? নিশ্চয় মামা আর ওপরের ঘরে খোকন গাঢ় ঘুমে। একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল ললিতা।

সিগারেটের শেষাংশ ছুড়ে বাগানে ফেলল নিরঞ্জন। অন্ধকারে বেশ কয়েকটা জোনাকির জ্বলা-নেভা। এই এখানে নীলচে আলো, তো পরমুহূর্তে ওখানে অন্ধকার। দিন পনেরো আগে জর্জ ওকে বলেছেন, 'শুনেন নিরঞ্জনবাবু, ডাক্তার খোকনের ব্যাপারে আর বিশেষ আশা দেয় নাই। ওর যদি আমার অনুপস্থিতিতে বাড়াবাড়ি হইয়া যায়, হেই চিন্তায় আমার রাতে ঘুম হয় না। প্রোগ্রামের লাইগ্যা আমার মাঝে মাঝেই জামশেদপুর, পাটনা, উত্তরবঙ্গ, তারপর ধরেন এদিক-ওদিক যাইতেই হয়। খুকির ইস্কুলে ছুটি নাই, ও সবসময়ে আইয়া থাকতে পারে না। খোকনেরও এই বাড়ি ছাইড়্যা নিমতায় অসুবিধা হয়। অরে লইয়া এখানকার পাট গুটাইয়া আপ্নেগো কাছাকাছি উইঠ্যা যাওয়াও সম্ভব না। এইখানের মতো ডাক্তার-বদ্যির সুবিধা কুথাও পাওয়া যাইব না। তাছাড়াও বাড়িয়ালা বাড়ি ছাড়নের লাইগ্যা কেস করছে। এহন বাড়ি ছাড়ার অর্থ পালাইয়া যাওয়া। আমি হাইর‍্যা পালাইতে শিখি নাই।'

নিরঞ্জন চুপ করে শুনছিল। দেবব্রতর মনের অবস্থাটা বোঝা যাচ্ছে। এসব কথায় এমন একটা কষ্ট লুকানো আছে, সহ্য করাই কঠিন।

আবার বলেছিল জর্জ, 'আমার অনুপস্থিতিতে যদি খোকনের অসুস্থতার সংবাদ পান, টাকার লাইগ্যা ভাববেন না। আমি স্টিলের আলমারির লকারে সবসময় বেশ কিছু টাকা রাইখ্যা যাই। একডা ডুপ্লিকেট চাবি আমি খুকিরে দিয়া যাব।'

এসব চিন্তা মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা তৈরি করছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আর পারছিলেন না নিরঞ্জন। 'চল, শুয়ে পড়ি।' শিথিল স্বরে ললিতাকে বললেন তিনি। বারবার মনে পড়ছে জর্জ যখন এই কথাগুলো বলছিল, ওঁর গলা বুজে আসছিল। নিজের ছেলের মতো দেখে সে খোকনকে।

'কালকে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু বললে না যে?' ললিতা প্রশ্ন করল।

'যেতে ইচ্ছে করছে, যাবে। আমি কি তোমাকে কখনও বাধা দিয়েছি? চল, শুয়ে পড়ি। কাল সকালেই আবার ছাত্ররা এসে যাবে। তার আগে ঘুম থেকে উঠে বাজারে যেতে হবে।'

অন্ধকারে টর্চ হাতে দু-একজন যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। বোধহয় শিয়ালদা থেকে শেষ ট্রেনও এসে গেল।

'খোকনকে ছেড়ে এইভাবে থাকা যে তোমার পক্ষে কত কষ্টের!' নিরঞ্জন যেন নিজের মনেই বলছে। 'বিয়ের পরে ব্রাহ্ম মেয়ে বলে আমার মা তোমাকে কম কথা শোনায়নি। আমিও তেমন করে প্রতিবাদ করতে পারিনি। হাজার হোক আমারই তো মা। তুমি সেসব কথা ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি। আজ মা তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। সব সময় 'ললিতা-ললিতা' জপ করছে।'

ললিতা আর কথা বাড়তে দিল না। বলল, 'থাক ওসব। তুমিও আমাকে বিয়ে করে কম ঝামেলায় পড়নি। আত্মীয়-স্বজন কেউ এল না। ওসব কথা মনে হলেই মন খারাপ হয়ে যাবে, ঘুম আসবে না।'

দুজন যখন বারান্দা থেকে শোবার ঘরের দিকে, তখন আকাশের চাঁদ প্রায় মাঝখানে। খুব হালকা একটা জ্যোৎস্নায় সব কিছুকে খুব মায়াময় মনে হচ্ছে। কলকাতার রাতের সঙ্গে শহরতলির রাঁতের অনেকটা পার্থক্য। নটার পরই এখানে ক্রমশ শুনশান। দেরি করে বাড়িতে ফেরা মানুষরা রাস্তায় হাঁটে সসঙ্কোচে।

এই বাড়িটা আপাতত দোতলা। প্রথমে ছিল একতলার দুটি ঘর। পরে সিঁড়ি আর ওপরের আরও দুটো ঘর, ঝুলবারান্দা। স্বামী-স্ত্রী যখন যেমন পেরেছে টাকা জোগাড় করে একটু একটু করে বাড়ির আয়তন বৃদ্ধি করেছে। নীচের ঘরে নিরঞ্জনের বাবা-মা, একটায় খাওয়া। কলকাতা নয়, এখানে মশারি খাটাতে হয়। প্রথম প্রথম ললিতার মশারির নীচে ঘুম না আসলেও এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

রাত গভীর। দূরে কোনো রাতজাগা পাখির ডাক। অচেনা। কিন্তু খুব মিষ্টি লাগছে ললিতার। ঘুম আসছে না। অকাতরে পাশে ঘুমোচ্ছে ছোট মেয়ে ঝান্টি, পাশে টাবুলও গভীর ঘুমে। বড় মেয়ে মান্টিকে নিয়ে পাশের ঘরে নিরঞ্জন ঘুমোন। দেবব্রত টাবুলকে বলে হাদু আর মান্টিকে ছিদু। কি জানি খোকনটা কি করছে? সকলে ঘুমিয়ে, নিজের ঘুম না এলে মানুষের বড় অসহায় লাগে। ললিতার এরকম হলে, খালি মনে হয় সিঁড়ি দিয়ে কে যেন আসছে, জানলায় কে দাঁড়িয়ে! গা ছমছম করে ওঠে।

হঠাৎ পায়ের খসখস আওয়াজ। নিরঞ্জন ঘরে ঢুকল। উনি নিশ্চয় ঘুমোতে পারছেন না। আজকাল যে কি হয় কোনো কোনো রাতে ঘুম আসতে চায় না।

'কি হল, ঘুমোওনি?' নিরঞ্জন একটু ঝুঁকে ললিতাকে দেখে প্রশ্ন করলেন।

'ঘুম আসছে না। যখন শুয়েছিলাম তখন মনে হচ্ছিল দু'চোখে ঘুম। তোমার কি হল?' ললিতা শুয়েই প্রশ্ন করল।

'খালি উল্টোপাল্টা চিন্তা মাথায় আসছে।' সাদা চুলের মধ্যে হাত চালাচ্ছিলেন নিরঞ্জন।

'আমারও। খোকনটা ভালো আছে তো?'

'ভালো আছে নিশ্চয়। না হলে তোমার ভাই খবর পাঠাত।'

মশারি তুলে বাইরে আসল ললিতা। মায়ের মন, একবার দুশ্চিন্তা ধরলে আর ছাড়তে চায় না।

'ঘুম আসছে না। চল ছাদে গিয়ে বসি। কতদিন ছাদে যাই না।' নিরঞ্জন যতটা সম্ভব আস্তে বললেন। এমন ভাব যাতে বাচ্চাদের ঘুম না ভাঙে।

'তোমার উদ্দেশ্য খারাপ।'

'না-না, সেসব কিছু নয়। এমনি, ছাদে চল গল্প করব।'

খুব সন্তর্পণে ছাদের দরজা খুলে ওরা মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালো। ছাদে একটা মাদুর পাতা। বোধহয় মেয়েরা বিকেলে বসেছিল, গুটিয়ে তুলতে ভুলে গেছে। দু'জনে পাশাপাশি বসল। সামান্য হাওয়া দিচ্ছে। ঘরে বোঝা যাচ্ছিল না। নারকেল গাছের পাতায় ঝিরঝির শব্দ। কতদিন এইভাবে বসে আকাশ দেখেনি দু'জন।

'তোমার কার্শিয়াঙের কথা মনে আছে? আমার কেন জানি হঠাৎ কার্শিয়াঙের কথা মনে হচ্ছে।' ললিতা বলল।

'কার্শিয়াং...' খুব টেনে টেনে উচ্চারণ করল নিরঞ্জন। জীবনের অন্য দিকের ঘটনা যেন! চুপ করে গেল আবার। কাজের চাপে, ব্যস্ততায় কোথায় যেন হারিয়ে গেছিল দিনগুলো। যুগান্তর দল থেকে ক্রমশ কমিউনিস্টদের সঙ্গে পরিচয়। ওদের নির্দেশের উত্তরবঙ্গ যাত্রা। চাঁদপুরের জমিদারের ছেলে, আগেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বাবার ত্যাজ্য পুত্র। ছোট টিনের বাক্সে সামান্য জামাকাপড় আর কতকগুলো বই নিয়ে প্রথমে হাসিমারা, সেখান থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কার্শিয়াঙে থিতু। কাজ, চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা। মাঝে মাঝে আসতেন রতনলাল ব্রাহ্মণ। মিটিং করতেন, নির্দেশ দিতেন। জ্যোতি বসুও স্বাস্থ্যোদ্ধারের নামে প্রায় একমাস থেকে গেলেন। নিরঞ্জনরা শ্রমিকদের বন্ধু হচ্ছে ক্রমশ। গাঢ় সবুজ চা গাছের পাতার ফাঁকে কখনও লাল পতাকা।

সমতলের কমরেডরা খবরই রাখতেন না, এইসব অঞ্চলের মিশনারিদের প্রভাবের। একপাশে মালিকদের অত্যাচার, অন্য দিকে মিশনারিদের আশ্বাস, মাঝখানে হাজার হাজার দরিদ্র শ্রমিক। মিশনারিরা ইস্কুল গড়ছে, সমাজসেবা করছে, নিজেদের প্রমাণ করতে সর্বস্ব পণ করছে। এর মধ্যে পার্টির সংগঠন গড়ে তোলা! মালিকপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে যদিও বা আন্দাজ করা যেত, মিশনারিরা ছিল প্রায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মুখে হাসি ফাদারের দিকে তাকালে মনেই হয় এরা দেবদূতের মতো এখানে এসেছে। পার্টির নেতৃত্ব বারবার বলেছে, তাদের কাছে খবর আছে দুই পক্ষের মধ্যে গোপন যোগাযোগ আছে।

নিরঞ্জনরা এখানে আসার দু'মাসের মধ্যেই চা বাগানে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হল। প্রবল শীতের সময়, কি মারাত্মক শীতল হাওয়া, তার মধ্যে রাতের অন্ধকারে বস্তিতে মিটিং। কমরেড রতনলাল এসেছেন। বলছিলেন, 'খবর আছে কয়েকদিনের মধ্যে মিশনারিরা এখানে ফ্রি-ক্যাম্প করবে। ভুখা শ্রমিকদের বিনি পয়সায় খাবার দেবে। এমনিতে ব্যাপারটা ভালো মনে হলেও উদ্দেশ্যটা খারাপ। ওরা ধর্মঘট ভাঙতে চায়।'

'কেন পেটে খাবার থাকলে তো ওরা আরও বেশিদিন লড়তে পারবে।' নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের ধারণা তা নয়। ইতিহাস তা বলে না।' পাশ থেকে উত্তর দিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির একজন বয়স্ক কমরেড। উনি এর আগেও কয়েকবার এসেছেন। 'কমরেড, এখানে মাটি কামড়ে কাজ করার জন্য আপনারা শ্রমিকদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। যেভাবেই হোক শ্রমিকভাইদের মিশনারিদের ক্যাম্প থেকে সাহায্য নেওয়া বন্ধ করতেই হবে।'

'ওদের রোজগার বন্ধ। ঘরে খাবার নেই। বাচ্চারা খেতে পাচ্ছে না। কিভাবে এটা সম্ভব?' অপূর্ব জিজ্ঞাসা করল। ও নিরঞ্জনের মতো এখানে সংগঠন গড়ছে।

'সে পথ আপনারা ভাববেন। আমরা শুধু পার্টির অভিমতটা জানালাম।'

দিন চারেকের মধ্যেই নিরন্ন কুলি বস্তিতে মিশনারিরা ক্যাম্প করল। বস্তির পাশেই বড় বড় কড়াইতে রান্না বসল। শীতের হাওয়ায় চাল, ডাল ফোটার গন্ধ ভাসছে, ঢুকছে বস্তির ঘরে ঘরে। বিশেষ করে মায়েরা দ্রুত চঞ্চল হয়ে উঠল। পার্টির নির্দেশে সকাল থেকেই বস্তির ঘরে ঘরে বেশ কয়েকজন যুবক বলে বেড়াচ্ছে, মালিকরা প্রায় পরাজিত হতে চলেছে। প্রচুর টাকা লোকসান হয়ে যাচ্ছে তাদের, আর কয়েক দিনের মধ্যে ওরা শ্রমিকদের দাবি মানতে বাধ্য হবে। ব্যস, আর দু-একটা দিন।

শীতের সকাল। হাতে কাজ নেই। ঘরের সামনে সার বেঁধে বসে ছেলে, মেয়ে, বাচ্চারা। কারও গায়ে লোম-ওঠা সোয়েটার, কারও বা ছেঁড়া কোট। রোদ উঠলেও হাতে হাত ঘষে নিজেকে গরম করার চেষ্টা করছে অনেকে। আকাশ নীল। পাহাড়ের গায়ে ঘন, লম্বা গাছ। সবুজ পাতায় সূর্যের আলো চমক দিচ্ছে। এত প্রশান্ত একটা পরিবেশের অন্তস্থলে নিরন্ন মানুষদের খিদে। কুলি বস্তির সর্দারের ছেলে তেজেন্দ্র এখন কমরেড, সে ঘরে ঘরে বলে এসেছে সাহেবরা মালিকদের লোক। এমনকি ওর কয়েকজন বন্ধু এও প্রচার করেছে, ওরা খাবারে কি মিশিয়েছে কে জানে!

ধৈর্য বটে ফাদার স্টিফেনের, ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে সব দেখাশোনা করছে। কিন্তু বস্তির কাউকে ডেকে বলছে না, খেয়ে যাও। বড় বড় হাঁড়িতে গরম খিচুড়ি রাখা। গরম খিচুড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে ভাসছে গন্ধ। দুপুরের পরে উড়ে এল কুয়াশা, রোদ্দুর হারিয়ে যাচ্ছে আবছায়ার আড়ালে। শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে। সূর্য দ্রুত ডাফ পাহাড়ের পিছনে লুকিয়ে যাচ্ছে।

সবে নিরঞ্জনরা ভাবছে, যাক আজ দিনের মতো ফাঁড়া গেল। শ্রমিকদের সঙ্গে ওরাও তিন দিন সামান্য ভুট্টার দানা খেয়ে আছে। একটা বড় সাফল্যের আনন্দে অনেকটা যখন নিশ্চিন্ত, ছুটতে ছুটতে এল তেজেন্দ্র। হাঁপাচ্ছে। বলল, 'মহিলা শ্রমিকরা আর কথা মানছে না। ওরা ক্যাম্পের খাবার বাচ্চাদের খাওয়াবে, তবে বলছে নিজেরা খাবে না। ওরা নাকি বাচ্চাদের খিদে আর সহ্য করতে পারছে না।'

অনেক বাদ-প্রতিবাদ, বাধা অগ্রাহ্য করে প্রায় সত্তর জন মা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে যখন ক্যাম্পের মাঠে খেতে বসল, সূর্য তখন তার শেষ রশ্মি দীর্ঘ পাইনগাছের শীর্ষের

পাতা ছুঁয়ে যাই-যাই করছে। অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংকল্প খান খান হয়ে গেল। অনেক শ্রমিক নিরঞ্জনদের চোখের সামনে খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। জীবনে এই ধরনের পরাজয় দেখেনি নিরঞ্জনরা।

রাতে এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন আলোচনা করছিল, মিশনারিদের ক্যাম্প বয়কট করার সিদ্ধান্ত তবেই সফল হত, যদি পার্টির পক্ষ থেকে অন্তত এই ভুখা মানুষগুলোকে একমুঠো করে চিড়ে-গুড় দেওয়া যেত।

দু'দিনের মধ্যেই শ্রমিকরা, এমনকি, তেজেন্দ্রকেও এড়িয়ে যেতে লাগল। মিশনারিদের ক্যাম্প উঠে গেল ধর্মঘট ভেঙে যাওয়ার ঠিক পরে। শ্রমিকরা কোনো দাবি আদায় না করেই মাথা নিচু করে বাগানের কাজে যোগ দিল। দীর্ঘ প্রস্তুতির এই ধরনের পরিণতি, মাথা তুলতে পারছিল না নিরঞ্জনরা।

নেতৃত্বের কয়েকজন এসে মিটিং করলেন। ঠিক হল, কমরেডদের এই পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে এখানকার জন্য আলাদা করে তহবিল তৈরির চেষ্টা করা হবে। নিরঞ্জন আর অসীমকে এখানে রেখে বাকি দুজনকে আলিপুরদুয়ার পাঠিয়ে দেওয়া হল। নির্দেশ দেওয়া হল প্রয়োজনে ওদের দুজনকে মিশনারিদের সঙ্গে কাজ করে এখানে পার্টির ভিত আরও মজবুত করতে হবে।

পরিচ্ছন্ন জ্যোৎস্নায় ছাদে বসে দু'জন। প্রায় প্রৌঢ়। ললিতা স্বভাবমতো ছাদেও হাত পাখা নিয়ে এসেছে। দু'জনেই নিশ্চুপ। যে যার স্মৃতির জগতে হারিয়ে গেছে। রাত কত হল? উত্তর মেলে না। মাথার ওপরে চাঁদ হেলে গেছে অনেকটা। হালকা হাওয়া, আমপাতার শব্দ। পৃথিবীর অন্য এক রূপ।

'মনে আছে আমাদের প্রথম দেখা?' ললিতা যেন নিজের মনেই বলল।

'মনে আছে। জীবনের কোনো কোনো ঘটনা ভোলা যায় না। তোমরা দল বেঁধে কার্শিয়াং এলে। আই. পি. টি. এ.-র কলকাতা শাখা। মে মাস। জানুয়ারির শ্রমিক ধর্মঘট ভেঙে যাওয়ার পর, আমিও মিশনারিদের স্কুলে মাস্টারির চাকরি নিয়েছি। সন্ধেবেলা পেলিকান নামের বাড়িতে রোজকার মতো গল্প করতে গিয়ে দেখলাম তোমাদের। মণির দিদির বাড়ি। জর্জ, শম্ভু, মণি, তুমি, আরও যেন কে কে ছিল। মনে আছে তুমি আর জর্জ সেদিন সন্ধেতে গান গেয়েছিলে 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল...।'

ললিতা তাকিয়ে নিরঞ্জনের দিকে। কতদিন লোকটাকে নজর করে দেখা হয় না। সত্যি কার্শিয়াংকে কেন্দ্র করে কত জায়গায় ওরা অনুষ্ঠান করেছিল সেবার। অনুষ্ঠান করে বেশ কিছু টাকাও সংগ্রহ করেছিল ওরা।

একমাস বাদে জর্জ, শম্ভুরা কলকাতায় চলে আসলে, ওখানে থেকে গেছিল ললিতা। সেই ঢালু পথ, গাছপালা, হঠাৎ উড়ে আসা কুয়াশার কথা ভাবতে ভাবতে ললিতার চোখে ঘুম নেমে এল।